শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

রচিত একটি উপকারী প্রবন্ধ

দাওয়াহ ও জিহাদের বিষয়ে সর্বসাধারণকে সম্বোধন: শৈথিল্য ও চরমপন্থার মাঝে ভারসাম্যকরণ

বালাকোট
BALAKOT MEDIA

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত
একটি উপকারী প্রবন্ধ

দাওয়াহ ও জিহাদের বিষয়ে সর্বসাধারণকে সম্বোধন: শৈথিল্য ও চরমপন্থার মাঝে ভারসাম্যকরণ

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

..."হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদাত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করছি!"[১]

[১] সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৯

আমাদের দাওয়াহ ও জিহাদকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা নেবার আছে। এই শিক্ষা দায়ী ও মুজাহিদগণের সামনে যে পথ আছে তা সহজতর করে দেবে এবং তাদেরকে সফলতা অর্জন করতে সাহায্য করবে। ফলে দাওয়াহ ও জিহাদে কল্যাণ আসবে এবং একই সঙ্গে তা দায়ী ও মুজাহিদীনদেরকে মন্দ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান, মহিমামন্ডিত জীবন ইতিহাসের উপর যত্ন সহকারে গবেষণা ও বিবেচনা করলে যে কেউ জানতে পারবেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিভাবে পরিচালিত করতেন। ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, দাওয়াহ এর ভাষা, পদ্ধতি, একাধিক পন্থার মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম এবং কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে ইত্যাদি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করে দাওয়াহ দিতেন তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতেন:

• সম্বোধিত ব্যক্তির স্বভাব এবং তার আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থানের পটভূমি। কাজেই একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষজন, তাদের গোত্রসমূহ, এবং তাদের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

• সম্বোধিত ব্যক্তির দাওয়াহ গ্রহণের স্পৃহা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তার অবস্থান, অর্থাৎ সে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কি না সেই তথ্য।

• মুমিনদের দল এবং দাওয়াহ এর সামর্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট পর্যায়, অবস্থা, বাস্তবতা বা সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।

এসবকিছুই করা হয় শরীয়তের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী। যেকোনো ব্যাপারে লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যবেক্ষণ করতেন যে, শরীয়তের অপরিবর্তনীয় নীতিমালা এবং দ্বীন ও তাওহীদের সুদৃঢ় খুঁটিসমূহ লঙ্ঘন না করে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী উপকার বয়ে এনেছে এবং সবচেয়ে বেশী ক্ষয়-ক্ষতি এড়াতে সহায়তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াহ এর প্রারম্ভিক যুগের দিকে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাওয়াহ এর সম্বোধিত ব্যক্তির স্বভাব, নৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের পটভূমি এবং যেসকল গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে সেগুলোকে কিরূপে বিবেচনা করতেন এবং গুরুত্ব দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন ইসলামের শত্রু ছিলেন, তখন তিনি ও রোমানদের নেতা হেরাক্লিয়াসের মাঝে একবার কথোপকথন হয়। সেখানে হেরাক্লিয়াসের প্রশ্ন ছিল, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে কি করার নির্দেশ দেন?" হেরাক্লিয়াসের এই প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দাওয়াহ এর প্রতি মানুষদেরকে সম্বোধন করতেন তার মূলভিত্তি তথা তাওহীদের কথা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলে চলেন, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নামায পড়া, যাকাত দেয়া, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্র ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন।" এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন, দাওয়াতের বক্তব্য কতটা শক্তিশালী হলে তা শত্রুর মনেও গেঁথে যায়!

অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াদা পালন করা, আমানতদারিতা রক্ষা করা, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া, ভালোবাসাহীন কর্কশ ব্যবহারকে তিরস্কার করা এবং অনুরূপ সর্বজনস্বীকৃত উত্তম গুণাবলী চর্চা করার নির্দেশ দিতেন। জনগণকে দ্বীনের ভালো দিকগুলো দেখানোর জন্যই তিনি এমনটা করেছিলেন। এটা এজন্য যেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে পারেন যে, যেসকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজের বুদ্ধিমান ও অভিজাত মানুষেরা গর্ববোধ করে এবং যেসকল উত্তম গুণাবলীকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সেগুলোকে উৎকর্ষ দান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাতের ব্যাপারে দাওয়াহ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে কুরাইশরা সম্মান করতো এবং তাঁর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বুঝান যে, তিনি এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর সবচেয়ে যোগ্য অনুসারী।

একইভাবে, হেরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরিত পত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের বাণীর পরেই উল্লেখ করেন,

"ইসলাম গ্রহণ করুন এবং আপনি নিরাপত্তা লাভ করবেন, এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি আপনি ইসলামের এই দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার অধীনস্তদের বিপথগামিতার গুনাহসমূহ আপনার উপর অর্পিত হবে।"

এই বার্তা হেরাক্লিয়াসের রাজ্যে তার অধীনস্তদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হেদায়াতের জন্য চিন্তিত ছিলেন, এবং সেই সাথে এটা আরও ইঙ্গিত করে যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হেরাক্লিয়াসই দায়ী ছিল। এ ধরনের বিবৃতির মাধ্যমে নবীগণ (আলাইহিমিস সালাম) প্রমাণ করেছিলেন যে, তারা আন্তরিকভাবেই মানুষদের হেদায়াতের জন্য চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ভয় করেছিলেন। সকল নবীর (আলাইহিমিস সালাম) দাওয়াতেই একই মঙ্গল কামনা, উদ্বেগ ও আশংকা প্রতিধ্বনিত হয়। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ﴿٥٩﴾

..."হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদাত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করছি!"[২]

এমন কথা ব্যবহারে কোনো লজ্জা নেই যা মানুষের হেদায়াতের ব্যাপারে একজন দায়ী বা মুজাহিদের আন্তরিকতার সাক্ষ্য দেয়। এটি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে কিভাবে তাদের মঙ্গল কামনা করে, কিভাবে সে দুর্বল ও মজলুমদের সাহায্য করতে ভালবাসে এবং তাদেরকে জুলুম থেকে, জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের শোষণ থেকে রেহাই দিতে চায়, অথবা কিভাবে সে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর লড়াই করতে চায় জুলুম, মন্দ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। আল্লাহর কসম, দুর্বল মনের অধিকারীরা এবং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন ও অন্যান্য সকল নবীদের (আলাইহিমিস সালাম) দাওয়াতের ব্যাপারে অজ্ঞ

[২] সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৯

লোক ছাড়া আর কেউ এমন কথায় লজ্জা পেতে পারে না অথবা তার সমালোচনা করতে পারে না।

আমদের দ্বীন এসেছে সমগ্র মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করতে, এবং তাদেরকে দাসদের (সৃষ্টির) ইবাদত থেকে মুক্ত করে সকল দাসের পালনকর্তা এক আল্লাহর ইবাদতমুখী করতে। আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ।

এ ধরনের বিবৃতি দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে না, অথবা তার নীতিগুলোকে অস্পষ্ট করে ফেলে না, কিংবা কাফেরদেরকে তোষামোদ করে না। বরং এটি দ্বীনের অপরিবর্তনীয় মৌলিক ভিত্তিসমূহ থেকে উৎসরিত এক জ্যোতির্ময় ও সুদৃঢ় সত্যকে উপস্থাপন করে। মানুষদের কাছে দায়ীকে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। যে সকল কাফেররা এই সকল গুণাবলীকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে তাদেরকে সম্বোধনের সময় এই সত্যকে আলোকিত করা এবং তুলে ধরার মাঝে দোষের কিছু নেই।

হুদায়বিয়াহ সন্ধির ব্যাপারে বুখারীতে বর্ণিত একটি ঘটনাও এই বিষয়টির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কুরাইশ বংশের বনু কিনানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাছে এসে বললো, "এ হচ্ছে অমুক ও অমুক এবং সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কোরবানির জন্য নির্ধারিত পশুদেরকে সম্মান করে, তাই পশুগুলো তাকে দিয়ে দাও।" তাই তাকে পশুগুলো দিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে সমাদর করা হয় যখন তাঁরা তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে সে বলে উঠলো, "আল্লাহ মহান! এই লোকসকলকে কাবায় যেতে না দেয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না।" পরে সে তার গোত্রের মানুষদের কাছে ফিরে এসে বললো, "আমি মালা পরানো এবং চিহ্নিত করা কোরবানির পশু দেখেছি, তাই আমি মনে করি যে, তাদেরকে কাবায় যেতে না দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না...।"

সুতরাং তৎকালীন সময়ে জনগণের সাধারণ অবস্থার প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা সম্পর্কে ভাবুন। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাঁর বাণী,

“ঈমান হচ্ছে ইয়েমেনীদের মাঝে, আর কুফর পূর্ব দিক হতে; শান্তি তাদের মধ্যে যারা ছাগল ও ভেড়া লালনপালন করে, আর অহংকার ও লোকদেখানো ভাব – এবং আরেক বর্ণনা অনুযায়ী: আত্মগরিমা - রয়েছে ঘোড়ার অসামাজিক ও অভদ্র মালিক আর বেদুঈনদের মধ্যে।”

এর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সেসকল মানুষদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন যাদেরকে নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন।

তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার মাধ্যমে কুরাইশদেরকে আক্রমণ করতে আদেশ দেন তখন তিনি তাঁকে আগে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গিয়ে কুরাইশদের যুদ্ধ ও ইতিহাসের ব্যাপারে জেনে নিতে আদেশ করেছিলেন। একইভাবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় প্রথমে বলেন, “তুমি কিতাবীদের কাছে যাচ্ছ।” এরূপে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রথমেই তাদের আদর্শিক বা সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং তারপর নির্দেশ করেন যে, কিভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদেরকে সম্বোধন করার সময় কোন বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে এবং কি বিষয় দিয়ে তাদেরকে দাওয়াহ দেয়া শুরু করতে হবে।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করুন এবং তা নিজের অন্তরে গেঁথে নিন। তারপর ভেবে দেখুন কিভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষদেরকে তাদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী দাওয়াহ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছেন। মানুষেরা যে ব্যাপারগুলো শ্রদ্ধা করে সেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তিনি সেগুলোকে স্পষ্টভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের সামনে তুলে ধরতেন! এই বিষয়টি বুঝার জন্য সংকীর্ণমনা হওয়া থেকে সতর্ক হোন, এ ব্যাপারটিকে কোনো প্রকারের চাটুকারিতা বা তোষামোদ ভাববেন না, যেমনটা অজ্ঞ লোকেরা ভেবে থাকে। কারণ বুখারীতে এসেছে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায়,

“মানুষদেরকে তাদের বুঝ অনুযায়ী দাওয়াহ দাও – তুমি কি এমনটা পছন্দ করবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা দেয়া হোক?”

সম্বোধিত ব্যক্তি একগুঁয়ে ও দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নাকি শান্ত ও শুনতে ইচ্ছুক এই বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিজ্ঞ বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিম্নোক্ত নির্দেশ বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং কখনোও তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিস্কার করে নি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন,

۞ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ

তোমারা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতীত কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের কথা আলাদা...[৪]

অনুরূপভাবে, স্বৈরশাসক ফেরাউনকে প্রথমবার সম্বোধন করার সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আমায়) ভয় করবে।[৫]

---

[৩] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮

[৪] সূরা আনকাবূত, আয়াত: ৪৬

[৫] সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৪

কিন্তু যখন সে সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

..."তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন (তাঁর একত্ববাদ ও সর্বশক্তিমত্তার) প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ; হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।"[৬]

তাই একবার ভেবে দেখুন, তাঁরা (আলাইহিমাস সালাম) ফেরাউনকে প্রথমে কিভাবে সম্বোধন করেছিলেন, আর একগুঁয়েমি প্রদর্শনের পর কিভাবে তাকে সম্বোধন করেছিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিভাবে মুমিনদের ও তাঁদের দাওয়াতের সামর্থ্য এবং তাঁরা যে পর্যায়ে বসবাস করছিলেন তার প্রকৃতি, এবং জিহাদের বিধানসমূহের ধারাবাহিক আগমনের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাও লক্ষ্যণীয়; যেখানে প্রাথমিক সময়ে ইসলামের শত্রুদের কৃত আক্রমণের প্রতিউত্তরে আক্রমণ না করা, ক্ষমা করা, উপেক্ষা করা এবং সেসকল মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাদের কৃত ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে ধৈর্যশীল হবার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

মুমিনরা যখন হিজরত করলেন এবং আশ্রয় ও সমর্থন পেলেন, এবং তাঁরা যখন তাঁদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন, তখন তাঁদেরকে আত্মরক্ষামূলক ও মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু তখনও তা তঁদের উপর ফরয (আবশ্যকীয়) ছিল না।

এই সময়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অনেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন যাদের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য আরও বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মুনাফিকেরা

---

[৬] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০২

কিভাবে তাঁদের ক্ষতিসাধন করেছে তা শুনে সাহাবীরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন সেসকল মুনাফিকদের হত্যা করার অনুমতি চেয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আবেদন করতেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিতেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও, (নতুবা) মানুষেরা বলবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।" কোনো সময় তিনি বলতেন, "তাহলে ইয়াসরিবে অনেকগুলো নাক তার জন্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।"

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি করেছিলেন এবং তাদের বিদ্যমান চুক্তি এই পর্যায়ে তুলে ধরেছিলেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনকি তাদের সাথে এই চুক্তিও করেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে তারা তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষতি করতো এবং "রাইনা" বলতো যা অত্যন্ত অপমানজনক কথা হিসেবে বিবেচিত হতো, এবং তারা বলতো, "আমরা শুনি এবং তোমরা যেন কিছুই শুনতে না পাও," এবং অনুরূপ অন্যান্য বাক্য বলতো যা তিনি ধৈর্য সহকারে সহ্য করতেন। তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু কামনা করে তাঁকে অভিবাদন জানাতো। এর জবাবে তিনি সহজ উত্তর দিতেন, "ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরেও)।" তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষতিসাধন করা সত্ত্বেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না, তাদেরকে হত্যা করতেন না। বরং এর বিপরীতে যখন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে বারণ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আইশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে তাদের কৃত অনিষ্টের পাল্টা জবাবে তাদেরকে অভিশাপ দিতে বারণ করতেন, আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "যেখানে উদারতা পাওয়া যায় সেখানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, আর যেখানে উদারতা নেই তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।" নিঃসন্দেহে এগুলো একারণেই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থার কথা বিবেচনা করতেন যেটা তখনও সূচনাপর্বের কাছাকাছি ছিল ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল মাত্র।

পরবর্তী আদেশ ছিল সীমালঙ্ঘনের প্রতিউত্তরে অনুরূপ জবাব দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যারা ঈমানদারদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ি ও সম্পদসমূহ থেকে বহিষ্কার করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদরে মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করেন। এটাই ছিল তাঁদের প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়, কারণ তা মদীনার অধিকাংশ কাফেরদের ঘাড়ে আঘাত হানে ও বাকিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। এই পর্যায়ে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সংখ্যক ইহুদীকে বশীভূত করেন, যাদের মৃত্যু মুসলমানদের বা তাঁদের রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি সাধন করবে না; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের তাগুত কাব ইবনুল আশরাফ এবং তার মতো অন্যান্যদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপকহারে এই হত্যাকান্ড ঘটান নি; বরং, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা তাঁর ক্ষতি করেছিল এবং যাদেরকে হত্যার ফলে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না। যখন মদীনার পরিস্থিতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য আরও স্থিতিশীল হলো, তখন তিনি কিছু সংখ্যক লোককে নির্বাসিত করেন এবং কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন, কিন্তু এগুলোও করা হয়েছিল ইহুদীরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করার ফলস্বরূপ, এবং তা করা হয়েছিল মদীনাবাসী ও সেসকল নতুন মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে যারা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ও স্বার্থযুক্ত ছিল। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো ভালো কারণ ছাড়া এর আগেই এমনটা করতেন তাহলে তা তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করতো। কিন্তু নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্মপদ্ধতি ছিল প্রাজ্ঞ শরীয়ত এর ফিক্হ ও রাজনীতি ভিত্তিক; আর যে কেউই এই শরীয়ত এর দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত, নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্ট হবে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে।